BL College Journal
https://doi.org/10.62106/blc2023v5i2bg3
ISSN 2664-228X (Print)
ISSN 2710-3684 (Online)
Volume -V, Issue-II, December 2023
Pp. 22-28

সমাজ পরিবর্তনে কীর্তন: একটি সমীক্ষা

ড. সুদেষ্ণা বণিক

সারসংক্ষেপ

ভারতীয় সংস্কৃতি অনুসারে সংগীত হল গীত, বাদ্য ও নৃত্য-এই তিনের সমন্বয়। ভারতীয় ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, সুদূর অতীত কাল থেকে ধর্মীয় উপাসনার প্রধান অঙ্গ হিসেবে বিবেচিত হত এই সংগীত। কালে কালে এই সংগীত মূলতঃ দুটি ধারায় বিভক্ত হয়: ১) অভিজাত নাগরিক সংগীত ও ২) গ্রামীণ লোকসংগীত। এই সংগীত শুধু মানুষের সাংস্কৃতিক রুচিরই পরিচায়ক নয়, বরং সমাজের মধ্যকার অস্থিতিশীলতা, অরাজকতা, কুসংস্কার ইত্যাদি দূর করারও অন্যতম হাতিয়ার।

বাংলার নিজস্ব অভিজাত সংগীত হল কীর্তন, আর যুগে যুগে বাংলার সমাজ পরিবর্তনের ক্ষেত্রে এই কীর্তনের ভূমিকা অনস্বীকার্য। মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য সর্বপ্রথম সামাজিক অবস্থার পরিবর্তনে কীর্তনের প্রত্যক্ষ প্রয়োগ করেন। তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করে এই পথের পথিক হন শ্রী নরোত্তম দত্ত ঠাকুর। মূলতঃ তাঁর প্রচেষ্টাতেই বিখ্যাত খেতরি মহোৎসব আয়োজিত হয় যেখানে কীর্তনের 'নিবদ্ধ গীতরূপ'-এর প্রচলন ঘটে এবং গরাণহাটি চালের কীর্তনের প্রবর্তন ঘটে। সেদিনের সেই মহোৎসব থেকেই কীর্তন গান 'অভিজাত নিবদ্ধ সংগীত'-এর মর্যাদা লাভ করে। কালক্রমে এই ধারার অনুসরণে সৃষ্টি হয় আরও চার প্রকার চাল বা রীতির কীর্তন– মনোহরসাহি, রেনেটি, মন্দারিনী ও ঝাড়খণ্ডী।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে যখন 'কবি গান' ও 'পাঁচালি গান'-এর প্রবল জনপ্রিয়তার কারণে কীর্তন গান তার আভিজাত্য হারাতে বসেছিল তখন সামগ্রিকভাবে কীর্তনকে বাঁচাতে, মানব সমাজে তার লোকপ্রিয়তা ফিরিয়ে দিতে সৃষ্টি হয়েছিল 'ঢপ কীর্তন'-এর। এই ঢপ কীর্তনের দ্বারা বাংলা কীর্তন গানের হৃতগৌরব ফিরিয়ে আনা এবং সর্বসাধারণে এই ঢপকে প্রবল জনপ্রিয় করে তোলার পেছনে মধুসূদন কিন্নর বা মধু কান নামক গায়কের কৃতিত্ব অনস্বীকার্য। মূলতঃ মধু কানের কৃতিত্ব ও প্রচেষ্টাতেই বাংলা কীর্তনের হারিয়ে যাওয়া জনপ্রিয়তা ফিরে আসতে শুরু করে এবং ধীরে ধীরে তা সর্বসাধারণ্যে ছড়িয়ে পড়ে।

বাংলা কীর্তন প্রকৃতপক্ষে প্রাচীন ভারতীয় প্রবন্ধ গানের উত্তরসূরী যেখানে দেশজ লোক-সুরের ছোঁয়াও রয়েছে। এই কারণেই এই শৈলী যেমন গ্রামীণ মানুষের হৃদয় জয় করেছিল, তেমনই অভিজাত নাগরিক সমাজের কাছেও ছিল আদৃত। তাই বাংলা প্রায় সকল প্রকার গানের বিখ্যাত স্রষ্টারা (পঞ্চকবি সহ) নানান ভাবে তাঁদের গানে কীর্তনের প্রয়োগ করেছেন এবং এইভাবে তাঁরা সমাজের সকল শ্রেণির মানুষের মধ্যে মেলবন্ধন ঘটিয়েছেন।

ড. সুদেষ্ণা বণিক
পি. এইচ. ডি. (কণ্ঠসঙ্গীত, কীর্তন)
রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, কোলকাতা
পশ্চিমবঙ্গ, ভারত
e-mail: banik_sudeshna132.yahoocom

মূলশব্দ

সংগীত, সমাজ, সংস্কৃতি, কীর্তন, পরিবর্তন, সামাজিক ভূমিকা

ভূমিকা

ভারতীয় সংস্কৃতি অনুসারে সংগীত হল গীত, বাদ্য ও নৃত্য-এই তিনের সমন্বয়। কবে, কোথা থেকে, কেমন করে এই সংগীতের সৃষ্টি হল তা নিশ্চিত করে বলা যায় না। তবে বিভিন্ন গ্রন্থে সংগীতের উৎপত্তি বিষয়ে বিভিন্ন মতবাদ উল্লিখিত আছে। আর, সবচেয়ে সমর্থিত সূত্রানুযায়ী প্রকৃতির বিভিন্ন সুরেলা শব্দকে অনুকরণ তথা অনুসরণ করেই মনুষ্য সমাজে সংগীতের প্রচলন ঘটেছে।

পদ্ধতি

এটি মূলত অনুসন্ধান ভিত্তিক রচনা। সংগীতের সাথে প্রকৃতি ও সমাজের অন্তর্নিহিত সম্পর্ক বিচার ও বিশ্লেষণকারী বিভিন্ন লেখা পর্যালোচনা করেই একটি সীমিত আলোচনা এখানে তুলে ধরা হয়েছে।

বিশ্লেষণ

ভারতীয় ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, সুদূর অতীত কাল থেকে ধর্মীয় উপাসনার প্রধান অঙ্গ হিসেবে বিবেচিত হত এই সংগীত। কারণ, প্রাচীন কাল থেকে দেব-দেবী অথবা নরপতি ও বিশিষ্ট ব্যক্তিদের গুণ, কীর্তি তথা লীলার বর্ণনে কাব্যপদ (Verse) ও গেয়পদের (Lyric) ব্যবহার প্রচলিত ছিল। যদিও সংজ্ঞানুযায়ী কাব্যপদ ও গেয়পদের কিছু বিভেদ ছিল, কিন্তু তৎকালীন রীতি অনুযায়ী প্রায় সকল পদই সুরে গাওয়া হত। আর এই সকল গানকেই 'পদগান' বলা হত যা রচয়িতা নিজেই সুর ও তালসহ গাইতেন। নির্দিষ্ট গীতশৈলী না থাকায় প্রাচীন পদগানকে 'প্রবন্ধ' বা গেয়পদ অর্থাৎ Composition বলা হত যা দু'ভাবে প্রযুক্ত হত– ১) নাট্যাশ্রিত অর্থাৎ নাটকের আকারে কাহিনী নির্ভর পদাবলী গান এবং ২) নাট্য বহির্ভূত কাহিনীর অংশবিশেষ নিয়ে একটিমাত্র পদে গান। দেশি রাগ সম্বলিত এই প্রবন্ধ ছিল 'অভিজাত সংগীত'-এর পর্যায়ভুক্ত। আবার গ্রামীণ মানুষের রুচি ও চাহিদার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ যে সংগীত প্রচলিত ছিল তা গ্রাম্য বা 'লোকগীত'-এর পর্যায়ভুক্ত ছিল। পরবর্তীকালে আপামর মানুষের সাংস্কৃতিক রুচির সাথে তাল মিলিয়ে প্রবন্ধ ও লোকগীতের মাঝামাঝি এক প্রকার সংগীতের সৃষ্টি হল যার নাম 'প্রকীর্ণ গান' তথা উপরাগসংগীত বা Classico Folk Song।

শিক্ষা যেমন মানব মস্তিষ্ককে পরিশীলিত করে, সংগীত তেমন মানব মনকে সুস্থিত করে। আবার, পারিপার্শ্বিক সমাজ ও পরিবেশ এই সংগীতকে অনেকাংশে নিয়ন্ত্রণ করে, পরিমার্জন ও পরিবর্তন করে। একইভাবে, সংগীতও সামাজিক বৈচিত্র্যকে এক সূত্রে গ্রথিত করে সামাজিক স্থিতিশীলতা বজায় রাখতে মুখ্য ভূমিকা পালন করে।

ভারতবর্ষের ইতিহাসে বারংবার রাজনৈতিক পালাবদল ঘটেছে যার ফলশ্রুতিতে ধর্মীয়, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। এখানে মধ্যযুগকে তুর্কি-মুসলিম শাসনামল হিসেবে আখ্যায়িত করা হয় যখন ভারতীয় কৃষ্টির সকল ক্ষেত্রেই একটা বিবর্তন ও পরিবর্তন চিহ্নিত করা যায়। এই সময় অর্থাৎ খ্রিস্টীয়

ত্রয়োদশ-চতুর্দশ শতকে বাংলা যখন মুসলমান শাসনে, তখন সংস্কৃত বিদ্যাচর্চা ও প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতি কিছুটা বাধাপ্রাপ্ত হয়। বাঙালি বিদ্যার্থীরা সেই সময় ন্যায়-স্মৃতি-মীমাংসা পড়ার জন্য পার্শ্ববর্তী রাজ্য মিথিলায় পাড়ি জমায় এবং বিদ্যার সাথে সাথে সেখানকার সংস্কৃতিরও একটা অংশ নিজেদের কণ্ঠ ও স্মৃতিতে ধারণ করে নিয়ে আসে এই বঙ্গে। আর এভাবেই বাংলার সাহিত্য ও সংস্কৃতি অঙ্গনে প্রবেশ করেন মিথিলার শ্রেষ্ঠ কবি বিদ্যাপতি ঠাকুর যাঁর প্রভাবে বাংলা বৈষ্ণব পদাবলী ও সংগীত নব কলেবরে সজ্জিত হয়। অতএব একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, মুসলমান শাসনের ফলে বাংলার সমাজ ও সংস্কৃতি যতটা ক্ষতিগ্রস্ত ও স্থবির হয়েছিল, বিদ্যাপতির পদাবলীর প্রভাবে তা অনেকাংশে কেটে গিয়েছিল।

কীর্তন যেহেতু বাংলার একান্ত নিজস্ব অভিজাত সংগীত, তাই বাংলার পরিবেশ ও সমাজ গঠন তথা সংরক্ষণে কীর্তনের ভূমিকা অনস্বীকার্য। বাংলাদেশে যতবার পরিবেশগত বা সামাজিক অস্থিতিশীলতা দেখা দিয়েছে, ততবার দেশ ও দেশের মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করতে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছে কীর্তন গান। জয়দেব গোস্বামীর 'শ্রীগীতগোবিন্দ' দিয়ে যার জয়যাত্রা শুরু, বড়ু চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি ঠাকুর, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু, নরোত্তম দাস ঠাকুর পরবর্তী অষ্টাদশ-উনবিংশ শতকের শ্রেষ্ঠ সংগীতকারদের পেরিয়ে বর্তমানেও সেই যাত্রা অব্যাহত।

যদিও বাংলা কীর্তনের প্রচার, প্রসার ও সর্বজনগ্রাহ্যতার জন্য প্রধান কৃতিত্বের অধিকারী হলেন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু, কিন্তু তাঁর আবির্ভাবের পূর্বেও বাংলায় কীর্তনের প্রচলন ও জনপ্রিয়তা ছিল। বাংলায় প্রাপ্ত প্রাচীন ইতিহাস, লিপি লেখন ও প্রত্ন-নিদর্শন অনুযায়ী খ্রিস্টীয় সপ্তম-অষ্টম শতাব্দী থেকেই পূর্ব ভারতের পুরাণ ও লোকসাহিত্যে কৃষ্ণলীলা সুপরিচিত হয়ে উঠেছে এবং বিষ্ণু-লক্ষ্মী সংক্রান্ত কাব্য-কাহিনীকে পেছনে ফেলে ভাগবতোক্ত কৃষ্ণলীলাই মানব মনন অধিকার করেছে। মূলতঃ সেন রাজবংশের রাজত্বকালেই বঙ্গদেশে বৈষ্ণব ধর্ম ও কীর্তনের প্রচার ও প্রসার ঘটেছিল। রাজা লক্ষ্মণ সেন ছিলেন এই বংশের সর্বাধিক খ্যাতিমান শাসক এবং তিনি নিজে পরম বৈষ্ণব হওয়ায় তাঁর পৃষ্ঠপোষকতায়ই বাংলা কীর্তন তথা পদাবলী কীর্তনের শ্রীবৃদ্ধি ঘটে। খ্রিস্টীয় দ্বাদশ শতকে রাজা লক্ষ্মণ সেনের সভাকবি জয়দেব গোস্বামী সর্বপ্রথম আদি রসের আধারে রাধা ও কৃষ্ণের লীলা অবলম্বনে রচনা করেন "শ্রীগীতগোবিন্দ", যা বাংলা পদাবলী কীর্তনের প্রথম পথপ্রদর্শক হিসেবে স্বীকৃত। জয়দেবের রচনারীতিতে উৎসাহিত হয়ে পরবর্তীকালের বৈষ্ণব মহাজনেরা রাধাকৃষ্ণের লীলা সংক্রান্ত বহু পদ রচনা করেছেন যা যুগে যুগে আপামর বাঙালি সমাজকে আপ্লুত করেছে, ভক্তিরসে প্লাবিত করেছে।

বাংলা কীর্তন তথা বৈষ্ণব সাহিত্যের এই জয়যাত্রা বাংলায় মুসলমান অভিযানের প্রারম্ভিক যুগে অর্থাৎ খ্রিস্টীয় ত্রয়োদশ শতকের সূচনালগ্নেও অব্যাহত ছিল। এই সময়ের প্রখ্যাত পদাবলীকারগণ হলেন– মালাধর বসু, বড়ু চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি ঠাকুর প্রমুখ। তাঁদের রচনা মহাপ্রভুকেও বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছিল, আর এই ভক্তিরসকেই তীব্রতর করে বাংলার সমাজ ও সংস্কৃতিকে ব্যাপকভাবে প্রভাবিত করেছিলেন মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য।

খ্রিস্টীয় পঞ্চদশ শতকের প্রথম থেকেই বাংলায় ভিন্ন ধর্মের আধিপত্য ও ব্রাহ্মণ্য সমাজের গোঁড়ামির ফলে সাধারণ বাঙালি হিন্দুর জীবন অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল। একদিকে জোর করে ধর্মান্তরীকরণ, অপরদিকে গোঁড়া ব্রাহ্মণদের দাপট, দুই মিলে সাধারণ ও নিম্নবর্ণীয় হিন্দুরা দিশেহারা হয়ে পড়েছিল। এই অবস্থায় পঞ্চদশ শতকের শেষভাগে ধরাধামে অবতীর্ণ হন মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য। আনুমানিক চব্বিশ বছর বয়সে তিনি সন্ন্যাস নেন

এবং কৃষ্ণপ্রেমে মাতোয়ারা হয়ে সমাজ সংস্কারে এগিয়ে আসেন। ভীতু ও দুর্বল হিন্দু সমাজকে পুনর্জীবিত করতে তিনি হাতিয়ার করেন সংগীতকে। প্রধানত নাম সঙ্কীর্তনের মাধ্যমেই তিনি সর্বস্তরের হিন্দুদের একীভূত করার প্রয়াস পান। মূলতঃ তাঁর প্রভাবেই হিন্দু সমাজ উচ্চ-নীচ ভেদাভেদ ভুলে আবার এক পতাকাতলে দাঁড়াতে শেখে এবং নতুন করে বৈষ্ণব ধর্ম ও কীর্তনের জয় হয়। হিন্দুধর্ম সুদীর্ঘকালব্যাপী যে নেতা বা পথপ্রদর্শকের সন্ধান করছিল, মহাপ্রভু তার অবসান ঘটান। ভিন্ন ধর্মের আগ্রাসন ও নিজ ধর্মের জাত-পাতের বিভেদ মিটিয়ে সমাজে ঐক্য ফেরাতে তিনি প্রয়োগ করেন কীর্তন গানকে এবং তাঁর এই চেষ্টা ব্যাপক সাফল্য লাভ করে। শুধুমাত্র ভক্তিরসাশ্রিত কীর্তন গানের সাহায্যে মহাপ্রভু পতনোন্মুখ হিন্দু সমাজকে রক্ষা করেন।

মহাপ্রভুর প্রভাবে বাংলা পদাবলী কীর্তন নব কলেবরে ভাবাবেগ আশ্রিত হয়ে নবযৌবন লাভ করে। চৈতন্য-সমসাময়িক ও চৈতন্যোত্তর মহাজনেরা নবোদ্যমে ভক্তিরসাশ্রিত যে সমস্ত পদ রচনা করেন, তা শুধুমাত্র বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ না থেকে সর্বস্তরের পাঠক ও শ্রোতার মন জয় করে নেয়। মহাপ্রভুর আগে বৈষ্ণব পদাবলী গাওয়া হত ঠিকই, কিন্তু তার প্রকৃত গীতরীতি সম্বন্ধে জানা যায় না। চৈতন্যচরিতামৃত অনুযায়ী আমরা জানতে পারি যে বৈষ্ণব পদাবলীর গান মহাপ্রভুর অত্যন্ত প্রিয় ছিল। শ্রীচৈতন্যের অতি প্রিয় এই সমস্ত গায়ন শৈলীকে মনোহারিত্ব দেন মহাপ্রভুর শেষ জীবনের অন্তরঙ্গ পারিষদ ও সংগীত পারদর্শী স্বরূপ দামোদর। পরবর্তীকালে শ্রী নরোত্তম দত্ত ঠাকুর ও তাঁর মত আরও জ্ঞানী-গুণী সংগীত বিশারদদের চেষ্টায় বাংলা কীর্তন আরও নানান ধারা, উপধারায় ছড়িয়ে পড়েছিল।

মহাপ্রভু যেমন করে ক্ষয়িষ্ণু হিন্দু সমাজকে একদিন নিশ্চিত পতনের হাত থেকে রক্ষা করেছিলেন কীর্তন গানের সহায়তায়, তাঁর তিরোধানের পর সেই ধারা অব্যাহত রেখেছিলেন বাংলা পদাবলী কীর্তনে অভিজাত গায়নরীতির স্রষ্টা শ্রী নরোত্তম দত্ত ঠাকুর। উত্তরবঙ্গের রাজশাহী জেলার অন্তর্গত গোপালপুরের জমিদার শ্রী কৃষ্ণানন্দ দত্তের পুত্র শ্রী নরোত্তম দত্ত যৌবনে গৃহত্যাগ করে বৃন্দাবন যান এবং সেখানে বৈষ্ণবমতে দীক্ষা নিয়ে পরবর্তীতে একজন অন্যতম শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণব রূপে স্বীকৃত হন। পরবর্তীকালে তিনি নিজ জন্মভূমি, রাজশাহীর অন্তর্গত গড়েরহাট বা গরাণহাট পরগণার খেতরি গ্রামে ফিরে আসেন এবং গ্রামপ্রান্তে একটি কুটির তৈরি করে সেখানেই বৈষ্ণবীয় সাধনকর্মে নিযুক্ত হন।

শ্রী নরোত্তম দত্তের আবির্ভাব ও অবস্থানকালে উত্তরবঙ্গে সনাতন ধর্ম প্রায় বিলোপোন্মুখ ছিল। সাধারণ মানুষ ছিল কুসংস্কারাচ্ছন্ন। এছাড়াও ঐ অঞ্চলে তখন বৌদ্ধ ধর্মের ব্যাপক প্রসার ঘটেছিল যা সনাতন হিন্দু ধর্মকে হুমকির মুখে ঠেলে দিয়েছিল। এই অনাকাঙ্ক্ষিত পরিবেশ থেকে মানুষকে উদ্ধারের নিমিত্ত অগ্রণী ভূমিকা পালনে এগিয়ে আসেন শ্রী নরোত্তম দত্ত ঠাকুর। আর এই কাজে তিনি হাতিয়ার করেন কীর্তন গানকে, আয়োজন করেন খেতরি মহোৎসবের। তিনি উপলব্ধি করেছিলেন যে বৌদ্ধ ধর্মের কঠোর কর্মযোগ অপেক্ষা হরিনাম গান করা সাধারণ মানুষের কাছে অনেক সহজ ও আকর্ষক হবে। আধ্যাত্মিক সাধনার প্রেরণার সঙ্গে সংগীতের আনন্দ মিলে যে সাধারণ মানুষের মনকে সহজে আকর্ষণ করতে পারবে, তা নরোত্তম ঠাকুর অত্যন্ত ভালভাবে বুঝতে পেরেছিলেন। অতএব তিনি পাঁচটি বিগ্রহের সঙ্গে শ্রীগৌরাঙ্গের মূর্তি স্থাপন উপলক্ষ্যে আয়োজন করেন খেতরি মহোৎসবের এবং এই মহোৎসবে কীর্তনের জন্য যে আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছিল তা যে কোন তর্ক-বিতর্কের চেয়ে

অধিক কার্যকর প্রমাণিত হয়েছিল।

এই খেতরি মহোৎসবে গৌড়মণ্ডলের সকল বৈষ্ণব সম্প্রদায় আমন্ত্রিত হন এবং দেশ-বিদেশের বহু বিশিষ্ট পণ্ডিত, গায়ক-বাদক ও নর্তকের দোল এখানে যোগদান করেন। এই উৎসবে নরোত্তম ঠাকুর প্রাচীন প্রবন্ধ গীতাশ্রয়ী এক অভিনব কীর্তন পদ্ধতির প্রবর্তন করেন। গান আরম্ভ হলে একজন গায়ক যথাক্রমে উদারা, মুদারা ও তারা-র স্বরগ্রাম অনুযায়ী নিম্ন থেকে উচ্চে সুর প্রক্ষেপণ করতে থাকেন। এরপর প্রধান গায়ক নরোত্তম ঠাকুরের গলায় মালা পরানো হয় এবং তিনি কোথা ও সুরের সার্থক মেলবন্ধনে 'নিবদ্ধ গীত' আরম্ভ করেন। উপস্থিত দর্শক ও শ্রোতৃমণ্ডলী কীর্তন পরিবেশনের এই অভিনব রীতিতে যেন মন্ত্রমুগ্ধ হন এবং তাঁরা এই রীতিকে সাদরে গ্রহণ করেন। সেইদিন থেকে কীর্তন গায়নের এই রীতিই অভিজাত সমাজে আদৃত হয় এবং বর্তমানেও তা অনুসৃত হচ্ছে। কীর্তন পরিবেশনের এই বিশেষ রীতিই পরবর্তীতে গড়েরহাটি বা গরাণহাটী কীর্তন নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে। পরবর্তীকালে এই ধারার অনুসরণে আরও চার রীতি বা চালের কীর্তন প্রবর্তিত হয়। এগুলো হল-মনোহরসাহি, রেনেটি, মন্দারিনী ও ঝাড়খণ্ডী রীতি যা বর্তমানে প্রায় বিলুপ্ত।

সাহিত্য ও সংগীত একটা সমাজের জনরুচির পরিচয় বহন করে। যে কোন সময় সমাজের অধিকাংশ মানুষের সাহিত্য ও সংগীত প্রীতি আমাদের সেই সমাজের আভিজাত্যের মাণদণ্ড বুঝতে সহায়ক হয়। তারই নিরিখে আমরা 'অভিজাত সমাজ' ও 'লোকসমাজ' নির্ধারণ করি। কখনো অভিজাত সমাজের রুচি লোকসমাজের পর্যায়ে নেমে আসে, আবার কখনো লোকসমাজ সংস্কৃতিমনস্কতায় অভিজাত সমাজের সমকক্ষ হয়ে ওঠে।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে যখন 'কবি গান' ও 'পাঁচালি গান'-এর প্রবল জনপ্রিয়তার কারণে কীর্তন গান তার আভিজাত্য হারাতে বসেছিল তখন সামগ্রিকভাবে কীর্তনকে বাঁচাতে, মানব সমাজে তার লোকপ্রিয়তা ফিরিয়ে দিতে সৃষ্টি হয়েছিল 'ঢপ কীর্তন'-এর। কীর্তনের সুস্পষ্ট ছায়া সম্বলিত এই ঢপ কীর্তনে একদিকে যেমন বৈঠকী রাগরাগিনী যথাযথভাবে অনুসৃত হত, তেমনই এর প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল সুরের বিশিষ্ট ভঙ্গি। গানের মাঝে মাঝে এখানে 'কৃষ্ণ কহিতেছেন' বা 'শ্রীমতি কহিতেছেন' ইত্যাদি কথাগুলি সুরারোপ করে বলা হত। এই ঢপ কীর্তনের দ্বারা বাংলা কীর্তন গানের হৃতগৌরব ফিরিয়ে আনা এবং সর্বসাধারণে এই ঢপকে প্রবল জনপ্রিয় করে তোলার পেছনে মধুসূদন কিন্নর বা মধু কান নামক গায়কের কৃতিত্ব অনস্বীকার্য। অষ্টাদশ শতকের মধ্যভাগে তৎকালীন পূর্ববঙ্গের যশোর জেলায় এই অত্যন্ত প্রতিভাময় গায়কের জন্ম। নিজ প্রতিভা ও গায়কী বৈশিষ্ট্যে তিনি ঢপ কীর্তনকে অত্যন্ত মনোরঞ্জক ও প্রবল জনপ্রিয় করে তোলেন। মূলতঃ মধু কানের কৃতিত্ব ও প্রচেষ্টাতেই বাংলা কীর্তনের হারিয়ে যাওয়া জনপ্রিয়তা ফিরে আসতে শুরু করে এবং ধীরে ধীরে তা সর্বসাধারণ্যে ছড়িয়ে পড়ে।

কীর্তন যেহেতু ভক্তিভাব সম্বলিত গান, তাই এর লোকপ্রিয়তা সমাজের অধিকতর মানুষের ধর্মভাব বা মানবতাবাদের স্বাক্ষর বহন করে। ধরে নেয়া যায় যে, যে সমাজে বেশিরভাগ মানুষ ধর্মভীরু, সেই সমাজে অন্যায়, অবিচারের সংখ্যা নগন্য। তাই, বাঙালি সমাজে কীর্তনের প্রভূত জনপ্রিয়তা এই গোষ্ঠীর শান্তিকামী মনোভাবই প্রকাশ করে। কিন্তু যুগের সাথে পরিবর্তিত হয় মানুষের শিক্ষা, রুচি ও চাহিদা। যার ফলে অনেকসময় সমাজের স্থিতিশীলতা আঘাতপ্রাপ্ত হয়। বাঙালি সমাজও তার ব্যতিক্রম নয়। তবে যতবারই বাংলার সামাজিক

ও সাংস্কৃতিক পরিবেশ অস্থির হয়েছে, ততবারই পথপ্রদর্শকের ভূমিকা পালন করেছে কীর্তন গান।

অষ্টাদশ শতকের দ্বিতীয় ভাগ থেকে উনবিংশ শতকের বঙ্গ সমাজে শিক্ষা, সংস্কৃতি ও সামাজিক অবস্থানগত কারণে যে ব্যাপক পরিবর্তন সূচিত হয়, বাংলা গানের ক্ষেত্রেও তার ছোঁয়া লাগে। এই সময়ের জনপ্রিয় গানগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল-কবিগান, আখড়াই, হাফ আখড়াই, যাত্রা ও নাটকের গান, শাক্তগীতি, পাঁচালি, ব্রাহ্মসংগীত, টপ্পা প্রভৃতি। আর কীর্তন গানের অভিনবত্বের কারণে এই গান বাংলা প্রায় সকল প্রকার গানকেই প্রভাবিত করেছে।

বাংলা কীর্তন প্রকৃতপক্ষে প্রাচীন ভারতীয় প্রবন্ধ গানের উত্তরসূরী যেখানে দেশজ লোক-সুরের ছোঁয়াও রয়েছে। এই কারণেই এই শৈলী যেমন গ্রামীণ মানুষের হৃদয় জয় করেছিল, তেমনই অভিজাত নাগরিক সমাজের কাছেও ছিল আদৃত। কথা, সুর, তাল, ভাব এবং রস-সংগীতের সকল দিকেই এই গান বিশেষভাবে অভিনব। এই গানের সাথে একদিকে যেমন ধর্মীয় আবেগ জড়িত, তেমনই এর শিল্প-বৈশিষ্ট্যও অনন্যসাধারণ। তাই, ধনী-নির্ধন, শিক্ষিত-অশিক্ষিত নির্বিশেষে সকল শ্রেণির মানুষই এই গীতশৈলীর প্রতি আকৃষ্ট। তাই বাংলা প্রায় সকল প্রকার গানের বিখ্যাত স্রষ্টারা নানান ভাবে তাঁদের গানে কীর্তনের প্রয়োগ করেছেন এবং এইভাবে তাঁরা সমাজের সকল শ্রেণীর মানুষের মধ্যে মেলবন্ধন ঘটিয়েছেন।

বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের পঞ্চকবি-রবীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রলাল, রজনীকান্ত, অতুলপ্রসাদ ও নজরুল নিজ নিজ সৃষ্টিতে কীর্তনের প্রয়োগ করেছেন। বাংলা গানের এই পাঁচ অমর স্রষ্টা নিজেদের গানে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে কীর্তনের প্রয়োগের মাধ্যমে বাংলার একান্ত নিজস্ব এই অভিজাত গীতশৈলীর অনন্য রূপটিকে শ্রদ্ধা দেখিয়েছেন, স্বীকৃতি দিয়েছেন।

সমাজ সচেতন মানুষ মাত্রেই সমাজ সংস্কারে এই পাঁচ প্রতিভাধরের কৃতিত্ব জানেন ও মানেন। স্বাধিকার হোক বা স্বাধীনতা আন্দোলন, বঙ্গভঙ্গ রদ বা নির্ভেজাল দেশপ্রেম, সমাজের সকল ক্রান্তিলগ্নে এই মহান কবিরা ধরেছেন লেখনী, সৃষ্টি করেছেন অমর সংগীত। তাই তাঁরা যখন নিজ সৃষ্টিতে কীর্তনকে আশ্রয় করেন, তখন এই গানের বিশেষত্ব ও সুদূরপ্রসারী প্রভাব সহজেই অনুমান করা যায়। মানুষের হতাশাগ্রস্ত মন, ক্লান্ত হৃদয়কে প্রকাশ করতে, মানব মনের সুখ, দুঃখ, আনন্দ, বেদনা, প্রেম, বিরহ ইত্যাদি ভাবসমূহ ফুটিয়ে তুলতে কীর্তনাঙ্গ সুর, কথা ও ভাবধারার আবশ্যিক প্রয়োগ এই গানের উপযোগিতা প্রমাণ করে। তাই কবিগুরুর লেখনীতে যখন সৃষ্টি হয়, "না চাহিলে যারে পাওয়া যায়, তেয়াগিলে আসে হাতে.....", আমরা অবাক হয়ে দেখি, কি চমৎকারভাবে তিনি মানব মনের চিরন্তন আকুতিকে প্রকাশ করেছেন! যখন দ্বিজেন্দ্রলাল বলেন, "আমি সারা সকালটি বসে বসে এই সাধের মালাটি গেঁথেছি..." বা রজনীকান্ত লেখেন, "(আমি) অকৃতি অধম ব'লেও তো, কিছু কম ক'রে মোরে দাও নি.....", তখন সেখানে মানব মনের চির ব্যাকুলতা, প্রেম ও অপেক্ষার প্রকৃত স্বরূপটিই উন্মোচিত হয়। আবার যখন অতুলপ্রসাদ বলেন, "ওগো সাথী, মম সাথী, আমি সেই পথে যাব সাথে.....", তখন প্রেমিক হৃদয়ের চিরন্তন বাসনা ফুটে ওঠে। কাজী নজরুল যখন লেখেন, "রাধা তুলসী, প্রেম পিয়াসী, গোলোকবাসী শ্রীকৃষ্ণ নারায়ণ.....", তখন মানব মনের চিরন্তন সমর্পণের ভাবনাই যেন মূর্ত হয়ে ওঠে।

উপসংহার

কীর্তন এইভাবেই যুগে যুগে মানব মনের আর্তি প্রকাশ করেছে, মানব হৃদয়কে করেছে দ্রবীভূত। কীর্তনের প্রভাবে সামাজিক ব্যবধান ঘুচে গিয়ে মানুষে মানুষে নতুন করে তৈরি হয়েছে ভ্রাতৃত্বের বন্ধন। অন্ধকার, কুসংস্কারাচ্ছন্ন সমাজকে সরল বিশ্বাসের পথে আনতে, আলোর পথে আনতে মণীষীরা বারংবার হাতিয়ার করেছেন এই কীর্তন গানকে। তাই, কীর্তন শুধু বাংলা সংগীতকেই মহিমান্বিত করেনি, বরং বারবার বাংলার সমাজকে করেছে স্থিতিশীল ও শান্ত, সামাজিক উন্নয়নের ধারাকে করেছে অগ্রগামী। তাই কীর্তন সংগীতের কাছে বাংলা ভাষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি ও সমাজ, সকলেই চিরঋণী।

তথ্যনির্দেশ

১. বন্দ্যোপাধ্যায়, অসিতকুমার। বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত (প্রথম খণ্ড)। কলিকাতাঃ মডার্ন বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, ২০০৮।

২. বন্দ্যোপাধ্যায়, অসিতকুমার। বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত (দ্বিতীয় খণ্ড)। কলিকাতাঃ মডার্ন বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, ২০০৬-০৭।

৩. বন্দ্যোপাধ্যায়, অসিতকুমার। বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত (তৃতীয় খণ্ড- প্রথম পর্ব)। কলিকাতাঃ মডার্ন বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, ২০০৯-১০।

৪. বন্দ্যোপাধ্যায়, অসিতকুমার। বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত (তৃতীয় খণ্ড- দ্বিতীয় পর্ব)। কলিকাতাঃ মডার্ন বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, ২০০৯-১০।

৫. বন্দ্যোপাধ্যায়, অসিতকুমার। বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত (চতুর্থ খণ্ড)। কলিকাতাঃ মডার্ন বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, ২০০০।

৬. বণিক, সুদেষ্ণা। সঙ্গীতে বাংলা কীর্তনের প্রয়োগরীতি- দ্বিজেন্দ্রলাল, রজনীকান্ত ও অতুলপ্রসাদের গান। কলকাতাঃ নক্ষত্র প্রকাশন, ২৬ জানুয়ারি ২০১৫।